পাক্ষিক

আহমদী

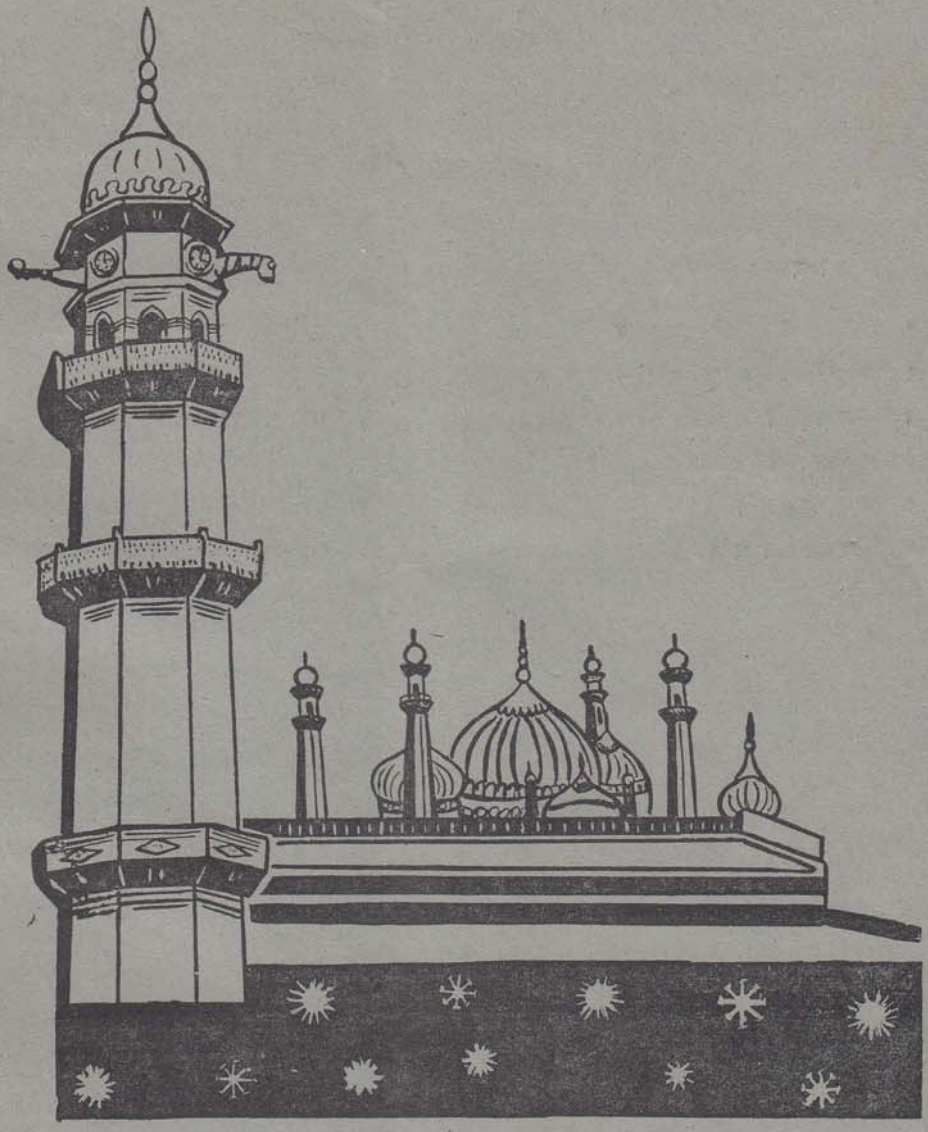

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আনওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

৯ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
২১শ বর্ষ

সূচীপত্র

৯ম সংখ্যা
১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৭ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ (রহঃ)	॥ ২১৭
॥ হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী	॥ অনুবাদক—মৌলবী মোহাম্মাদ	॥ ২১৮
॥ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী	॥ আমাদের শিক্ষা হইতে	॥ ২১৯
॥ শান্তির পথ ইসলাম	॥ মকবুল আহমদ খান	॥ ২২০
॥ খাতামান নবীঈন	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ২২৬
॥ বিশ্ব ধর্ম ও বিশ্ব শান্তি	॥ খোন্দকার আজমল হক	॥ ২২৯

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ২১শ বর্ষ : ১৫ই সেপ্টেম্বর : ১৯৬৭ সন : ৯ম সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরা তৌবা

৯ম রুকু

৬৭ ॥ কপট নর এবং নারীগণ পরস্পর এক পর্যায়-ভুক্ত। তাহারা (লোকদিগকে) অসৎ কাজ করিতে আদেশ দেয় এবং সৎকাজ করিতে বারণ করে এবং তাহাদের হাতকে (আল্লার পথে খরচ করিতে) বন্ধ রাখে। তাহারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া দিয়াছে অতএব আল্লাহ্‌ও তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিশ্চয় কপটগণই মহাপাপী।

৬৮ ॥ আল্লাহ্‌ কপট নর এবং নারীগণকে এবং (সমাগত নবীর) প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে নরকাগ্নির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তথায় তাহারা দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকিবে। উহা তাহাদেরই উপযুক্ত। আল্লাহ্‌ তাহাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। এবং তাহাদের জন্য রহিয়াছে স্থায়ী শাস্তি।

৬৯ ॥ (হে মুনাফেকগণ! এই শাস্তি) তোমাদের পূর্ববর্তীদের (শাস্তির অনুরূপ হইবে। তাহারা তোমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল এবং ধন ও সন্তান-সন্ততিও তাহাদের বেশী ছিল। বস্তুতঃ তাহাদের ভাগ, তাহারা

ভোগ করিয়াছে এবং তোমাদের ভাগ তোমরা ভোগ করিয়াছ যে ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাহাদের ভাগ ভোগ করিয়া গিয়াছে। এবং তোমরা আমোদ তামাশায় মত্ত হইয়াছ, যে ভাবে তাহারা আমোদ তামাশায় মত্ত হইয়াছিল। উহাদেরই কৃতকর্ম ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থ হইয়াছে এবং উহারাই ক্ষতিগ্রস্ত।

৭০॥ তাহাদের পূর্ববর্তীদের সংবাদ কি তাহাদের নিকট পৌঁছে নাই: নূহ, আদ, সামুদ এবং ইব্রাহীমের জাতির কথা এবং মদয়ানবাসী ও বিধ্বস্ত জনপদবাসীর কথা। তাহাদের রসুলগণ তাহাদের নিকট উজ্জ্বল প্রমাণপুঞ্জ সহ আগমন করিয়াছিল। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ এমন ছিলেন না যে, তাহাদের প্রতি অবিচার করেন; পরন্তু তাহারাই নিজেদের উপর অবিচার করিতেছিল।

৭১॥ ঈমানদার পুরুষ এবং স্ত্রীগণ পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তাহারা (লোকদিগকে) সৎকাজ করিতে আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ হইতে বারণ করে; নমাজকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং যাকাত প্রদান করে। এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁহার রসুলের হুকুম মানিয়া চলে। আল্লাহ্‌ উহাদিগের উপর সত্বর দয়া করিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়।

৭২। আল্লাহ্‌ ঈমানদার পুরুষ এবং স্ত্রীগণকে এমন বাগান সমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, যাহার নিম্ন দিয়া নদী নালা প্রবাহিত। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে, এবং চিরস্থায়ী উদ্যানরাজিতে, মনোরম আবাস সমূহে। অধিকন্তু আল্লাহ্‌র সন্তোষই সবচেয়ে বড় (নিয়ামত)। উহাই (মানব জীবনের) পরম ও চরম সফলতা। (ক্রমশঃ)

★

হযরত রসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর পবিত্রবাণী

কুধারণা ও বিদ্বেষ

পূর্ববর্তী জাতিনিচয়ের ব্যাধি—কুধারণা বিদ্বেষ তোমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। উহাদের কাজ খেউরী করা। আমি বলি না যে ঐগুলি চুল খেউরী করে বরং উহারা পূণ্যসমূহ খেউরী করিয়া ফেলে। (তিরমিযী)

* * *

কুধারণা পোষণ সম্বন্ধে সাবধান হও। নিশ্চয় কুধারণা পূণ্য সমূহকে সেইভাবে পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দেয়, যেভাবে অগ্নি শুষ্ক কাষ্ঠকে ভস্ম করিয়া ফেলে। (তিরমিযী)

* * *

বিভেদের অপকারিতা হইতে সাবধান হও। নিশ্চয় বিভেদ ধ্বংসাত্মক। (তিরমিযী)

* * *

যে কেহ মানুষের অহিত সাধন করে আল্লাহ্‌ তাহার অহিত করিয়া থাকেন এবং যে কেহ বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে আল্লাহ্‌ তাহার বিরুদ্ধাচরণ করেন। (তিরমিযী)

লজ্জা ও অশ্লীলতা

লজ্জা ঈমান হইতে ও ঈমান বেহেস্ত হইতে; এবং অশ্লীলতা অকল্যাণ হইতে ও অকল্যাণ দোযখ হইতে। (তিরমিযী)

* * *

কাহারো মধ্যে অশ্লীলতা পরিদৃষ্ট হয় না, পরন্তু তাহাকে লাঞ্ছিত করিবার জন্য। এবং কাহারও মধ্যে লজ্জা পরিদৃষ্ট হয় না; পরন্তু তাহাকে সুশোভিত করিবার জন্য। (তিরমিযী)।

* * *

পূর্ববর্তী নবীদের বাণীসমূহ হইতে যেগুলি প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছে, উহাদের মধ্যে একটি হইল 'যে কাজে কোন লজ্জা নাই, করিয়া যাও।' (বুখারী)।

* * *

নিশ্চয়ই প্রত্যেক ধর্মে একটি বৈশিষ্ট থাকে। ইসলামের বৈশিষ্ট লজ্জা। (ইবনে মাজা)।

* * *

আবু সঈদ আল খুদরী বলিয়াছেন—আল্লাহ্‌র রসুল অবগুণ্ঠিতা কুমারী অপেক্ষা বেশী লজ্জাশীল ছিলেন। কোন জিনিস তাঁহার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় ঠেকিলে, আমরা তাঁহার চেহারা দেখিয়া ধরিয়া ফেলিতাম। (বুখারী ও মোসলেম)

* * *

লজ্জা কল্যাণ ছাড়া কিছু আনে না। (বুখারী ও মোসলেম)।

সংকলক—মৌলবী মোহাম্মাদ

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর অমৃতবাণী

আমাদের খোদা প্রবল পরাক্রমের অধিকারী

সেই খোদা অতীব বিশ্বস্ত খোদা এবং তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত ভক্তদের জন্য বিস্ময়কর ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জগৎ তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে চায় এবং শত্রুগণ দন্ত পেষণ করে, কিন্তু খোদা, যিনি তাঁহাদের বন্ধু, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক ধ্বংসের পথ হইতে রক্ষা করেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদিগকে জয়যুক্ত করেন। কি সৌভাগ্যশালী সেই ব্যক্তি যে এরূপ খোদার আঁচল কখনও ছাড়ে না। আমরা তাঁহার উপর বিশ্বাস আনিয়াছি। আমরা তাঁহার পরিচয় পাইয়াছি।

সেই খোদাই সর্বজগতের অধীশ্বর, যিনি আমার প্রতি ঐশীবাণী অবতীর্ণ করিয়াছেন, আমার সপক্ষে মহা নিদর্শন প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আমাকে এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ করিয়া প্রেরিত করিয়াছেন। আকাশে বা পৃথিবীতে তিনি ছাড়া অন্য কোন খোদা নাই। যে ব্যক্তি তাঁহার উপর বিশ্বাস না আনে, সে বড়ই হতভাগ্য এবং অভিশপ্ত। আমি খোদার নিকট হইতে সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ঐশীবাণী প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি যে, তিনি সমস্ত জগতের খোদা এবং তিনি ভিন্ন অন্য কোন খোদা নাই। কেমন সর্বশক্তিমান এবং চিরস্থায়ী ও সংরক্ষণকারী সেই খোদা, যাঁহাকে আমি লাভ করিয়াছি। কি মহাশক্তি ও নৈপুণ্যের অধিকারী সেই খোদা, যাঁহাকে আমি দর্শন করিয়াছি! সত্য ইহাই যে, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। কেবল উহাই তিনি করেন না, যাহা তাঁহার প্রদত্তগ্রন্থ এবং প্রতিশ্রুতির বিরোধী। অতএব তোমরা দোয়া করিবার সময় সেই অজ্ঞ নেচারী বা নাস্তিকদের মত হইও না, যাহারা নিজ কল্পনা দ্বারা এমন কতকগুলি নিয়ম তৈয়ার করিয়া রাখিয়াছে যাহার সম্বন্ধে খোদাতালার গ্রন্থে কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। নেচারীগণ অভিশপ্ত; তাহাদের প্রার্থনা কখনও গৃহীত হয় না। তাহারা অন্ধ; চক্ষুষ্মান নহে। তাহারা না মৃত, না জীবিত। তাহারা খোদার সম্মুখে স্বরচিত নিয়ম উপস্থিত করে, তাঁর অসীম শক্তিকে সীমাবদ্ধ দেখে এবং তাঁহাকে দুর্বল মনে করে। তাহাদের সহিত তাহাদের অবস্থানুযায়ী ব্যবহার করা হইবে।

কিন্তু তুমি যখন দোয়া করিবার জন্য দণ্ডায়মান হও, তখন তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিতে হইবে যে, তোমার খোদা সর্ববিষয়ে শক্তিমান। এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে প্রার্থনা করিলেই তোমার প্রার্থনা গৃহীত হইবে এবং তুমি খোদাতালার মহাশক্তির বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দর্শন করিবে; যেরূপ আমি দর্শন করিয়াছি। আমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া সাক্ষ্য দিতেছি, কাহিনী স্বরূপ নয়। সেই ব্যক্তির প্রার্থনা কিরূপে গৃহীত হইতে পারে, যে ব্যক্তি খোদাকে সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান জ্ঞান করে না? মহা বিপদের সময় সেই ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার সাহসই বা কিরূপে হইতে পারে, যে ব্যক্তি প্রার্থনার দ্বারা বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করাকে প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ মনে করে?

কিন্তু হে সৎহৃদয় ব্যক্তিগণ! তোমরা কখনও এরূপ করিও না। তোমাদের খোদা এরূপ অদ্বিতীয় খোদা, যিনি আকাশে অগণিত তারকারাজি স্তম্ভ ব্যতিরেকেই ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন, যিনি পৃথিবীকে ও আকাশকে নিঃসত্তা অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি কি মনে কর যে, তিনি তোমার কার্যসাধন করিতে অক্ষম হইবেন? কখনও নহে, বরং তোমার অবিশ্বাসই তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে।

আমাদের খোদা অগণিত আশ্চর্য শক্তির অধিকারী কিন্তু মাত্র সেই ব্যক্তিই তাঁহার আশ্চর্য লীলা দর্শন

করিতে পারে, যে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার হইয়া যায়। যে ব্যক্তি তাঁহার শক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না এবং তাঁহার একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত সেবক নহে, তাহাকে তিনি তাঁহার আশ্চর্য লীলা সমূহ প্রদর্শন করেন না।

কত হতভাগ্য সেই ব্যক্তি যে আজও জানে না যে, তাহার এরূপ কোন খোদা আছেন, যিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। আমাদের খোদাই আমাদের স্বর্গ। আমাদের খোদাতেই আমাদের আনন্দ। আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাকে সকল সৌন্দর্যের অধিকারী পাইয়াছি। প্রাণের বিনিময়েও এই সম্পদ লাভ করিবার যোগ্য। এই মণি ক্রয় করিতে যদি সমস্ত শক্তি ও সামর্থ ব্যয় করিতে হয়, তবুও ইহা করা উচিত।

হে (খোদা লাভে) বঞ্চিত ব্যক্তিগণ! তোমরা এই প্রস্রবণের দিকে ধাবিত হও, ইহা তোমাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিবে। ইহা জীবনের উৎস, ইহা তোমাদিগকে জীবিত করিবে। আমি কি করিব এবং কি উপায়ে এই সুসংবাদ তোমাদের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিব? মানুষের শ্রুতিগোচর করিবার জন্য কোন্ জয়ঢাক দিয়া আমি বাজারে বন্দরে ঘোষণা করিব 'ইনি তোমাদের খোদা' এবং আমি কি ঔষধ প্রয়োগ করিব, যাহাতে শ্রবণের জন্য তাহাদিগের কর্ণ উন্মুক্ত হয়?

[আমাদের শিক্ষা হইতে]

★

॥ শান্তির পথ ইসলাম ॥

মকবুল আহমদ খান

মানুষ যুগ যুগ ধরে যা পাবার সাধনা করে এসেছে, তা'হল শান্তি। শান্তি লাভের পথ হিসেবেই যুগে যুগে দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের প্রবর্ত্তন ঘটেছে এবং মানুষ ধর্মের অঙ্গ হিসেবে ধ্যান ও সাধনা দ্বারা শান্তির অন্বেষণ করেছে। কেন না সব পাওয়ার চরম পাওয়াই শান্তি; আমরা যা কিছু চাই, শান্তি-প্রাপ্তির জন্যই চাই।

এটা ব্যক্তিগত জীবনের জন্য যেমন সত্য, জাতিগত ভাবে এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে তেমনি সত্য। এ কারণেই ইসলাম এ বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছে। বস্তুতঃ মানব-জীবনের প্রধান লক্ষ্যই শান্তি। তাই বিশ্বমানবের জন্য যে ধর্ম পৃথিবীতে আগমন করল, মানবের প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা তার নাম রাখলেন ইসলাম বা শান্তির ধর্ম।

ان الدين عند الله الاسلام

মানব জীবনের আসল লক্ষ্য বস্তু পাওয়ার সব ব্যবস্থাই বিশ্ব ধর্মে থাকা একান্ত আবশ্যক। "ইসলাম" নামই এ ব্যবস্থার পরিচায়ক। শুধু তাই নয়। ইসলাম নামটা এ ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও সার্বজনীনত্ব প্রকাশ করে থাকে, কারণ শান্তিই তো একমাত্র বস্তু যা সর্বকালের সর্বদেশের মানব সর্বাবস্থায় চেয়েছে। শান্তিলাভ হলে, আর কোনও চাওয়াইত বাকী থাকে না। যে ধর্ম এই চরম প্রাপ্তির দিকে আহ্বান করে তারই নাম ইসলাম।

এখন দেখা যাক্, কি করে ইসলাম এই শান্তিকে ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ জীবনে, জাতীয় জীবনে এবং আন্তর্জ্জাতিক জীবনে বজায় রাখবার ব্যবস্থা করেছে।

ব্যক্তি জীবনের সুখ শান্তির জন্য জীবনের উদ্দেশ্যকে বুঝার প্রয়োজন। কোরআনে বর্ণিত আছে—

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون

"আমি জিন ও মানবকে শুধু এবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি।" এখানে এবাদৎ দ্বারা শুধু নামাজ-রোজা,

করাকেই বুঝায় না, বরং নিজের জন্য মঙ্গলময় এবং জগদ্বাসীর জন্য শান্তিময় হয়, এম্নিভাবেই জীবনকে পরিচালিত করার নাম এবাদৎ। এই এবাদৎময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে নিজকে যোগ্য করার জন্যই নামাজ রোজা প্রভৃতির প্রয়োজন।

স্বার্থবিহীন সেবা ধর্মীয় জীবন যাপনের দ্বারা মহিমময় খোদাওন্দ করীমের গুণরাশির বহিঃপ্রকাশ যাতে আমার মাঝে ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে চলাই আমার এবাদৎ—কেননা আল্লাহ্ নিজকে তাঁর সৃষ্ট মানবের কার্য্যাবলীর মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান; যেমন হাদিস কুদসীতে আছে—

كنت كنزا مخفيا - فا حببت ان اعرف
فخلقت آدم

"আমি গুপ্ত ছিলাম, আমার ইচ্ছা হল পরিচিত ও প্রকাশিত হই—সেজন্যই আদমকে সৃষ্টি করলাম।"

তাই আমাদের ব্যক্তিজীবনের কার্য্যাবলীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে আমিত্বহীন সেবা ধর্মে নিজকে পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিই। এইজন্যই কোরআন শরীফ আমাদিগকে শিক্ষা দেয়—

قل ان صلوتى ونسكى ومحياى
ومماتى لله رب العلمين -

"আমার নামাজ, আমার কোরবানী, আমার জীবন মৃত্যু সবই আল্লাহ্র জন্য—যিনি রাব্বুল আলামীন।" এ প্রসঙ্গে "রাব্বুল আলামীন" কথাটাও অত্যন্ত প্রণিধান যোগ্য। "বিশ্ব প্রতিপালকের" জন্য আমার জীবন উৎসর্গ করে দেওয়ার মাঝে, একথাই নিহিত রয়েছে যে, বিশ্বের প্রতিপালনে আমাকেও অংশ গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনকে সার্থক করতে হলে বিশ্বের সেবায় নিজকে বিলিয়ে দিতে হবে। আমার নামাজ রোজা আমাকে সেইপথ দিয়ে নিয়ে যাবে। এরূপ বিলিয়ে দেওয়া জীবনই ইসলাম শিক্ষা দিয়ে থাকে। নিজের জন্য এবং সারা বিশ্বের জন্য যে এরূপ জীবন কল্যাণকর ও শান্তিময়, এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে? এমন জীবন পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে শুধু মঙ্গলই মঙ্গল বহন করতে পারে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকতে পারে কি?

একজন মুসলমানের জীবনের চরম সার্থকতাই রয়েছে, তার সবকিছু, তার ধনমান ও জীবনকে খোদার রাস্তায় তথা জগৎ সেবায় বিলিয়ে দেওয়ার মাঝে। এটাই স্বর্গের পথ। শান্তির পথ। তাই কোরআনে বলা হয়েছে—

ان الله اشترى من المؤمنين
انفسهم واموالهم بان لهم الجنة

"আল্লাহ্তালা মুসলমানদের জীবন ও ধন ক্রয় করছেন, বেহেস্তের পরিবর্ত্তে।" মানে, বেহেস্ত বা নিরবচ্ছিন্ন সুখ পেতে হলে ত্যাগ স্বীকার কর। এরূপ জীবন যাপন যে অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, সন্দেহ নাই। তাই আমাদিগকে এই পথে স্থায়ীভাবে ও দৃঢ়ভাবে রাখবার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্তালা দোওয়া শিখিয়েছেন—

اهدنا الصراط المستقيم

অর্থাৎ—আমাদিগকে স্থায়ী ও দৃঢ়ভাবে সঠিক পথে পরিচালিত কর।

একজন প্রকৃত মুসলমানের ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বপ্রকার ন্যায়নীতি ও পরোপকারকে ভিত্তি করে বিরাট সৌধের মত গঠিত।

ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজ ও জাতি। উপরোক্ত নিয়মে পরিচালিত ব্যক্তি জীবনের সমন্বয়ে গঠিত সমাজ নিশ্চয় শান্তিময় হতে বাধ্য। কিন্তু মানুষ যেহেতু ইসলামের ঐ নিয়ম অনুযায়ী জীবন যাপন করে না, সেজন্যই সমাজে নানাপ্রকার দুর্নীতি ও অশান্তি বার বার এসে দেখা দেয়। তাছাড়া, ইসলামী জীবন ধারায় বিশ্বাস নেই

এমন লোকও তো দেশে বা সমাজে থাকতে পারে। জীবন দর্শনে বৈপরীত্য থাকার দরুনও অশান্তি আসতে পারে, তাই সমাজ যাতে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, সেই জন্যই আল্লাহ্‌তালা কোরআনে বলেছেন—

والعصـر ان الانسان لفى خسر -
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق - وتواصوا بالصبر -

অর্থাৎ—"মানব-জাতি সাধারণতঃ অপরাধ প্রবণ, তাই তারা ক্ষতির মধ্যেই পড়ে থাকে, অবশ্য তারা ক্ষতির মধ্যে নয়, যারা শান্তির ধর্ম সততার সহিত পালন করেন এবং অন্যকে সত্যপথ প্রদর্শন করেন, ধৈর্য্য সহকারে।" এইরূপ শান্তিপূর্ণভাবে পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে জাতীয় চেতনাকে সত্য ও শান্তিমুখী করে তুলে মুসলমানরা একটি আদর্শ জাতিতে পরিণত হতে পারে। ভাল কাজ করা এবং অন্যকে ভলে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা, এটাই প্রকৃত শান্তির পথ। মুসলমানদিগকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্‌তালা বলেছেন—"কুনতুম খাইরা উম্মাতিন, উখ্‌রিজাৎ লিন্নাসে, তা'মরুনা বিল মারুফ ওয়া তান্‌হাওনা আনিল মুন্‌কারে।" সকলের মঙ্গলের জন্য মুসলমানের জাতীয় জীবন, পরহিত ব্রতই তার সাধনা, সৎকাজই তার লক্ষ্য, অসৎকাজ বা অশান্তি তাঁর নিকট ঘৃণ্য। এই শিক্ষাকে ভর করে গঠিত হয়েছিল প্রাথমিক মুসলমানদের জীবন তাই তাঁরা যেদিকে যেতেন বিজয় নিশান উড়াতেন। উন্নত জীবন-দর্শন ও আদর্শ জীবন যাপনই তাঁদের দিগ্বিজয়ের সহচর ছিল। জাতীয় জীবনে মুসলমানের যে আদর্শ উপরে কোরআন থেকে পেশ করলাম, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ইসলাম তা সমভাবে প্রয়োগ করেছে। কেন না ইসলাম জগতে এমন এক সৃষ্টিকর্তা পেশ করেছে, যার স্থান জাতীয়তাবাদের বহু উর্দ্ধে। তিনি শুধু আরবদেরই সৃষ্টিকর্তা নন, তিনি শুধু মুসলমানেরই সৃষ্টিকর্তা নন, বরং তিনি সর্ব চরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা—তিনি রাব্বুল আলামীন (সারা বিশ্বের প্রতিপালক)। সর্বকালের, সর্বযুগের, সর্বমানবের স্রষ্টা ও রক্ষক, সর্বশক্তিমান, অংশীদার-বিহিন, সর্বগুণাধার তিনি। তিনি সকলের নিকট গ্রহণ-যোগ্য। যারা খোদার একত্বকে মানে না, তারাও প্রকারান্তরে এমনি এক খোদাকে স্বীকার করে থাকে। তাদের বিভিন্ন 'মাবুদ' এই একই খোদার আংশিক শক্তি বলে তারা স্বীকার করে থাকে। এই আংশিক শক্তিধারী খোদা সার্বজনীনভাবে গ্রহণীয় হতে পারে না। তাই, এক সামগ্রিক খোদা, যার অংশীদার নাই, এমন খোদাকে ভিতরে ভিতরে, ধর্ম্মীয় আওতার বাইরে, তারাও স্বীকার করে থাকেন।

সকল ধর্মের খোদাকেই সংশ্লিষ্টগণ তাহাদের জাতীয় খোদাতে পরিণত করে,' তাঁকে খাটো করে ফেলেছেন। বাইবেলের উল্লিখিত খোদা "Lord God of Israil", এরূপ উল্লেখ বহুবার Bible-এ করা হয়েছে। যেমন—

(a) And David said to Abigail, "Blessed be the <u>Lord God of Israil</u>, who sent thee this day to meet me. (Samuel 25:32)

(b) Blessed be the <u>Lord God of Israil</u> for ever and ever, and all the people said, Amen, and praised be the Lord. (Chronicles 16:36)

(c) "God, the God of Israil, who only doeth wondrons things" (Psalms 72:18)

বেদে আমরা এগ্নিতরো বা তার চেয়েও সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীগত খোদার পরিচয় লাভ করে থাকি। সে খোদা সারা জাতির ও সারা বিশ্বের হওয়াত দূরের কথা, তাঁকে শুধু ব্রাহ্মণের খোদা বললেও অত্যুক্তি হবে না। কেন না ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারো বেদ পাঠের অধিকারই ছিল না বা নাই। (গৌতম স্মৃতি)। বেদ মানে না বা বেদের শিক্ষাকে গ্রহণ করে না এমন লোক বা জাতির জন্য বেদের শিক্ষা হল,—"সিংহনাদে ধ্বংস কর তাদের জীবন, ছিড়ে ফেল তাদের ভিটে বাটী, ব্যাঘ্র রোষে কর

তাদের আক্রমণ, [অথর্ব্ব বেদ (iv 22:7]। বেদে যে, শুধু সুর ও অসুরের যুদ্ধ আছে, তাই নয় বরং সুরে সুরেও যুদ্ধ দৃষ্ট হয়।

অন্যান্য ধর্মগুলির মূল শিক্ষা যাই থাকুক, জাতি বা গোত্রের গণ্ডীর বাহিরে সর্বমানবের গ্রহণের যোগ্য কোনও খোদা তাহাদের নাই। ইসলাম এসেই এক বিশ্বজোড়া খোদাকে দুনিয়ার সামনে পেশ করল, যিনি সারা বিশ্বের স্রষ্ঠা ও প্রতিপালক। সর্বশক্তিমান সর্ববিরাজিত ও সর্বজ্ঞ সেই খোদা। যিনি হিন্দুর মালিক, মুসলমানের মালিক, খ্রীষ্টানের মালিক, সর্বমানবের মালিক। তিনি ভারতের খোদা, পাকিস্তানের খোদা, আমেরিকার খোদা, আরবের খোদা, জল স্থল ও অন্তরিক্ষের খোদা, তিনি এক ও অদ্বিতীয় খোদা। সারা বিশ্ব তাঁরই সৃষ্টি। তাঁরই সৃষ্ট মানুষ হিসাবে দেশ-কাল ও পাত্রের প্রভেদ ভেদ করে, আমরা সকলে ভাই ভাই। ইসলামের খোদা মহা আদর্শ-স্থানীয় খোদা। যে বিশ্বাস করে, তিনি তারও প্রতিপালক, যে বিশ্বাস করে না, তিনি তারও প্রতিপালক। বিশ্ব পালকের এই একত্বই তার বিরাট বৈশিষ্ট্য যা অন্য ধর্মে পাওয়া যায় না। আর এই এক প্রভুর সৃষ্ট মানুষ আমরা। এই হিসাবে আমরা একই পিতার পুত্র। তাই আমাদেরও একটা একতা আছে যাকে আমরা বলতে পারি বিশ্বমানবের একত্ব বা Unity of mankind.।

ইসলামের এই আদর্শস্থানীয় খোদা, সর্বমানবের সর্বসময়ের চির জাগ্রত খোদা; তাঁর কৃপা সর্বসময়ে, সর্ব জাতির উপর সমভাবে বর্ষিত হচ্ছে। তাই কোরআনে সর্বজাতিকেই সম্মানের আসন দেওয়া হয়েছে। কোরআন ঘোষণা করেছে—

ولكل امة رسول

আরও ঘোষণা করা হয়েছে—

وان من امة الا خلا فيها نذير

অর্থাৎ—এমন জাতি নাই যার মাঝে নবী প্রেরণ করা হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে একজন মুসলমান কোরআনে আদিষ্ট হচ্ছে—

لا نفرق بين احد من رسله

অর্থাৎ—"আমরা নবীদের মধ্যে পার্থক্য করি না। সকলকেই সম্মান দেই।" তাই আমরা অন্যান্য জাতির নবীগণকে, তারা অবতার নামেই অভিহিত হোন বা অন্যনামেই অভিহিত হোন, সম্মান করে থাকি। কারণ এটা আমাদের নিকট ধর্মীয় আদেশ। তাই আমরা হযরত মূসা, ঈসা, জরোয়েষ্টার, কন্‌ফিউশাস, কৃষ্ণ, বুদ্ধ সকলকেই অতি ভক্তিভরে নামোল্লেখ করে থাকি এবং عليهم السلام বলে দরুদ পড়ে থাকি। এ কথার উত্তরে অনেকে হয়ত বা বলে বসবেন, "কৃষ্ণকে যখন আপনি নবী মানেন, তবে আপনি হিন্দু হলেইত পারেন।" অবশ্য এটা একটা বোকার প্রশ্ন। কেন না, কৃষ্ণের নবুওতের সময়ে যদি আমি সেই জাতির মধ্যে জন্ম নিতাম, তাহলে তাকে গ্রহণ করাই আমার উচিত হত, আর আল্লা হেদায়েৎ দিলে আমি তাকে গ্রহণ করতামই। এখন প্রশ্ন দাড়ায় কয়েকটি—বর্তমানে উপস্থিত হিন্দু ধর্ম কি সেই কৃষ্ণের প্রচারিত ধর্ম? এ যে কৃষ্ণ প্রবর্ত্তিত ধর্মের বিকৃত রূপ। আল্লাহ হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলকেই সৃষ্টি করেছেন এবং সকলকেই পরম যত্নে পুত্রবৎ প্রতিপালন করছেন। এর মধ্যে তফাৎ শুধু এ টুকুই যেটুকু ভাইয়ে ভাইয়ে থাকে। এক পিতার পাঁচ পুত্র একরূপ হয় না। কিন্তু তারা পাঁচ জনই একে অপরের ভ্রাতৃত্বের অধিকারী। এ বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বই শান্তির স্তম্ভ। ইস্‌লাম মানবের কল্যাণ ও শান্তিকেই কাম্য ও লক্ষ্য বলে নির্দ্দেশ দান করে। ইসলাম নিজের পথকে শ্রেষ্ঠ মনে করলেও অন্যের পথে বাধা সৃষ্টি করে না।

বরং ধর্মের স্বাধীনতাকে ইসলাম গৌরবের বস্তু মনে করে।

لا اكراه فى الدين
لكم دينكم ولى دين

অর্থাৎ—"ধর্ম্মের ব্যাপারে কোনও জবর দস্তি নাই।" "তোমার ধর্ম্ম তোমার কাছে, আমার ধর্ম্ম আমার কাছে।" ধর্ম্মের ব্যাপারে এরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত অন্য কোন ধর্মে নেই। এ উদারতা শান্তিরই পথ। এর তুলনায় অন্যান্য ধর্ম্মে আমরা কি দেখি? মূসা (আঃ)-এর ধর্ম্মগ্রন্থে মূসাকে আদেশ করা হচ্ছে "যাও বলপূর্ব্বক কেনান দেশে ঢুক, অধিবাসীদিগকে পরাভূত কর এবং তোমার নিজের লোককে সেখানে সংস্থাপন কর।" (পুরাতন টেষ্টামেণ্ট)। অপর দিকে, যীশু শিক্ষা দিলেন—"খারাপকে বাধা দিও না। বরং যদি কেহ তোমার ডান গালে আঘাত করে, তোমার অন্য গালটিও আঘাত কারীর কাছে পেতে দাও। (মথি ৫ঃ৩৯)।

ইসলাম এ দুই পথকেই শান্তি স্থাপনের পক্ষে সহায়ক নয় বলে মনে করে। আক্রমন যেমন নিন্দনীয়, আক্রমনের কাছে তেমনই নতী স্বীকারও নিন্দনীয়। কেন না, ব্যবহারিক জীবনে এ দুই পথই শান্তি ভঙ্গের পথ। বরং এদুয়ের মধ্যবর্তী পথই শান্তির পথ, তাই ইসলাম যুদ্ধ বাধানোর ঘোর বিরোধী। কিন্তু যদি কেহ যুদ্ধ বাধায়, তবে আক্রমনকারীকে হঠাবার জন্য যুদ্ধ করা মুসলমানের কর্তব্য বলে নির্ধারণ করেছে। (কোরআন ২২ঃ ৪০—৪২)। "আক্রমনকারীকে প্রতিহত করার জন্য আক্রমনকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অধিকার আক্রান্তকে দেওয়া হল।" এরূপ আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধের অনুমতিতেও কিছু সর্ত আরোপ করা হয়েছে। সুরা বকারার ১৯১—১৯৪ আয়াতে আছে—"তোমাদের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ কর। তবে তোমার যুদ্ধ আল্লাহ্ ও তাঁর ন্যায়নীতির খাতিরে হওয়া চাই। যুদ্ধ করলেও ন্যায়নীতির সীমা লঙ্ঘন করা নিষেধ। আক্রমন ও অত্যাচার দূরীভূত হওয়া মাত্র এবং ধর্ম কর্মের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্র যুদ্ধ বন্ধ কর।"

কোরআনের অন্যত্র রয়েছে যদি শত্রু-শক্তি শান্তির দিকে ঝুকে, তাহলে তুমিও দ্রুত শান্তির দিকে এগিয়ে যাও এবং সন্ধি কর। যদি শত্রুরা সন্ধির নামে প্রতারণা করার চেষ্টা করে তবুও সন্ধি করা ভাল। কেন না তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। (সুরা আল-আনফাল ঃ ৬২—৬৩)।

মোট কথা ইসলাম অর্থই শান্তি। অতএব যে ধর্মের মূল নীতিগুলি পালনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তারই নাম ইসলাম। হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) ইসলামের মাধ্যমে চির শান্তির বাণী বহন করে এনেছিলেন বলেই তাকে رحمة للعلمين বলে কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপ্লব ও অশান্তি বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। অশান্তির কারণগুলির মধ্যে (১) ধর্মের বিভিন্নতা বা আদর্শের বৈপরীত্য, (২) অর্থনৈতিক বৈষম্য (৩) রাজনৈতিক স্বার্থ (৪) সংকীর্ণ জাতীয়তা এবং (৫) সামাজিক অন্যায় ও অসাম্য প্রভৃতিই প্রধান। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক এবং আদর্শিক ও সামাজিক বিভিন্নতাকে স্বীকার করে নিয়ে, ইসলাম সমাধানের সূত্র বের করেছে। তাই এর নীতিগুলি ন্যায় এবং পূর্ণতায় পরিপূর্ণ ও ব্যবহারিক ভাবে উপযোগী। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মাঝে যে বৈষম্য বিরাজমান, তার প্রতি ইসলাম তেমন জোর দেয় নি। পরস্পর বৈরীভাব পোষণ করে নি। বরং বিভিন্ন ধর্মের একই উৎপত্তিস্থল নির্দেশ করে, সব ধর্মকে একটা সাধারণ সূত্রে গাথবার বিরাট প্রয়াস ইসলামে পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রত্যেক জাতিতেই নবী এসেছেন, একজন

মোসলিমের কাছে সকল নবীই সমানভাবে সম্মানীয়। অতএব কোন জাতির বা কোন ধর্মাবলম্বীই তার কাছে ঘৃণা বা বিদ্বেষের পাত্র নয়। ধর্মীয় সহনশীলতার ক্ষেত্রে ইসলামের উদার দৃষ্টান্ত আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইসলাম পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী, তথাপি একজন পৌত্তলিকের মাটীর দেবতাকে গালি দেওয়াও মুসলমানের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইসলামের পরমতসহিষ্ণুতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করতে প্রলুব্ধ হলাম। হিজরী ৬ষ্ঠ বৎসরে, সেণ্ট কেথারিণ গীর্জ্জার পাদ্রীগণকে এবং সাধারণভাবে সকল ইসায়ীগণকে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) যে সুবিধাদি দান করেছিলেন, তাকে শুধু ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নিদর্শনই নয় বরং ধর্মের মহিমা, মাহাত্ম্য ও উদারতার পরাকাষ্ঠা বললেও অত্যুক্তি হয় না। খৃষ্টান প্রজাগণকে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্যের বোঝা হতে অব্যাহতি দেওয়া হল। তদুপরি, অনেক সুবিধা ও সুযোগ খ্রীষ্টান প্রজাদের জন্য নির্দ্ধারিত করে দেওয়া গেল, যা মুসলিম প্রজারাও ভোগ করতে পারতেন না। পাছে মুসলমান লোকেরা খ্রীষ্টানদের সুবিধা ভোগে বাধা সৃষ্টি করে, এই ভয়ে রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) মুসলমান দিগকে হুকুম দেন, তারা যেন খ্রীষ্টানদের সুবিধা সুযোগগুলির উপর হস্তক্ষেপ না করেন। এ হুকুম অমান্য করাকে অপরাধ গণ্য করে, তিনি তার শাস্তিরও বিধান করেছিলেন। এই সুবিধাগুলির মধ্যে ছিল (১) হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) স্বয়ং এবং তার অনুচরেরা খ্রীষ্টানগণকে সর্বপ্রকার আক্রমণ থেকে এবং ক্ষতি থেকে রক্ষা করবেন। তাদের গীর্জা ও পুরোহিতগণকে রক্ষা করার পূর্ণ দায়িত্বও মুসলমানদের কাঁধে বর্তাল। অথচ তাদের উপর কোনও অতিরিক্ত টেক্সের বোঝাও চাপানো হল না। ধর্মের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাদের নিশ্চয়তা দে ওয়া হল। মুসলমানের স্ত্রী খ্রীষ্টান হলে তারও নিজ ধর্ম পালনের অধিকার স্বীকৃত হল। এমন কি যদি গীর্জা বা ধর্মস্থানের নির্মাণ ও মেরামতের ব্যাপারে খ্রীষ্টানগণ মুসলমানের সাহায্য দরকার মনে করে, তবে মুসলমানরা সাহায্য করবে বলে রসুলুল্লাহ্ নির্দেশ দান করলেন।

(See Spirit of Islam by Syed Ameer Ali)

ইস্‌লাম প্রবর্তিত নীতিই অর্থনৈতিক সমতার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। ইসলামের অর্থনীতিতে ধন বণ্টনের প্রক্রিয়া অতি গণতান্ত্রিক। এ নীতিতে জাতীয় ধন কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে পারে না, যেমনটা ধনতন্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে। পশ্চিমী ধনতন্ত্র জাতীয় সম্পদকে কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রভূত করে ফেলে এবং ধনীরা দিন দিন অধিকতর ধনী এবং গরীবরা দিন দিন অধিকতর গরীব হতে থাকে। আবার সোভিয়েট অর্থনীতিতে কেহ ব্যক্তিগত ভাবে ধনের অধিকারী হতে পারে না। সেখানে ব্যক্তি বিশেষের স্থানই নেই। অতএব ব্যক্তি প্রতিভা সেখানে স্থবীর হতে বাধ্য। মানুষকে সেখানে মেসিনের মত মনে করা হয়। ইসলামের অর্থনীতি এ দুই চরম পথকে বর্জ্জন করে, মধ্যপথ অবলম্বন করেছে। ধনের সুষ্ঠ বণ্টন এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ এ দুইটিকে স্বীকার করে ইসলাম উত্তরাধিকার, জাকাৎ ও সুদ-নিষেধের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা করেছে। ধনতন্ত্রবাদ ও সোভিয়েট সমাজবাদের প্রত্যেকটির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত কলহ রয়েছে এ দুইটির পরস্পরের মধ্যে যে শত্রুতা বিরাজ করছে, ইসলামের আর্থিক সাম্য তার বহু উর্দ্ধে। মোট কথা ইসলামের অর্থনীতিতে বিরোধের বীজ নেই বরং শান্তির বীজ নিহিত আছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশ নিজ নিজ দেশের স্বার্থকেই বড় করে দেখে। অতএব বিভিন্ন দেশের

মধ্যে স্বার্থের সংঘাত থাকা স্বাভাবিক। এরূপ আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ মিমাংসার জন্যও ইসলাম অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত ও ন্যায় সম্মত পথের সন্ধান দিয়েছে। এ ব্যাপরে ইসলামের নীতি হল বিরোধী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধে লিপ্ত না হয়ে নিজেদের মধ্যে বুঝাপড়া করবে এবং সমঝোতায় পৌঁছাবার চেষ্টা করবে। যদি এভাবে সমঝোত না হয়, তাহলে অন্য কোনও তৃতীয় জাতিকে মাধ্যম হিসাবে মেনে মীমাংসার ব্যবস্থা করবে। তৃতীয় ও মধ্যস্তের মাধ্যমে বিরোধ মিমাংসা না হলে, সালীশ মানতে হবে। সালীশের বিচার মেনে নিলেই, বিরোধের মিমাংসা হয়ে যায়। যদি সালীশের বিচারও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, তা'হলে অবাধ্য ও অনমনীয় জাতির বিরুদ্ধে অন্যান্য সব জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমন চালাবে, যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংঘবদ্ধ জাতির জন্য রাজনৈতিক শক্তির পার্শ্বে সৈন্য শক্তি থাকারও প্রয়োজন যা বর্তমান জাতিপুঞ্জের নেই। শান্তির উদ্দেশ্যেই এপথ-গুলি ইসলাম কার্যকরী নীতিরূপে গ্রহণ করেছিল।

সামাজিক পর্যায়ে ইসলামের সাম্য-নীতি তুলনা বিহীন। জাতি, বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে ইসলাম সকলকেই মানবিক মর্যাদা দান করেছে। বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ইসলাম দুনিয়ার সকলকে বাঁধতে প্রয়াস পেয়েছে। ইসলামের উদারতার কাছে হিংসা নিভে গিয়েছিল। যেখানে হিংসা, সেখানে ইসলাম নেই। কেন না ইসলামে হিংসার স্থান নেই। বস্তুতঃ ইসলামের সাম্য মানুষে মানুষে, পিতা পুত্রে, স্বামী স্ত্রীতে, নর ও নারীতে এমন কি শ্বেত-কালো ও প্রভু ভৃত্যে, এত ব্যাপক ভাবে রূপায়িত হয়ে এসেছে যে, ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। রসুলুল্লাহ্‌র জীবনের সমাজ সংস্কারের দিকটা বিবেচনা করলে, মনে হয়, সামাজিক বৈষম্য এবং মানুষের ভেদাভেদ দূর করে তাদের পরস্পর প্রীতির বন্ধনে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর জীবনের এক বিরাট ব্রত ছিল। এ যে মহান শান্তির ব্রত তা বলার প্রয়োজন পড়ে না। কাজেই যে সব সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক ও অর্থনৈতিক কারণে পৃথিবীতে শান্তি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা আছে, তার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইসলাম সুন্দর ও সুষ্ঠু সমাধানের পথ প্রদর্শন করেছে। বিশ্বব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপনে ইসলামের ভূমিকা অদ্বিতীয় বিধায় একে শান্তির ধর্ম বলা হয়েছে। অতএব, এই নামের সার্থক রূপায়ন মুসলমানেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য।

★

॥ খাতামান নবীঈন ॥

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

আরবী 'খাতামা' শব্দের 'তে' অক্ষরে যখন 'যবর' থাকে অর্থাৎ 'খাতাম' হয় তখন ইহা ইসমে আলা বা করণবাচ্যের বিশেষ্য পদ, অর্থ—মোহর, আংটি (আংটি দ্বারাও মোহরের কাজ করা হয়)। আর যখন 'তে' অক্ষরে 'জের থাকে অর্থাৎ 'খাতেম' হয় তখন ইহা কর্তৃবাচ্যের বিশেষ্য পদ বা ইসমে ফায়েল, অর্থ—মোহরকারী বা শেষকারী। অতএব পবিত্র কোরআনে যেহেতু 'তে' অক্ষরে 'যবর' সহ 'খাতামান নবীঈন' এসেছে, এজন্য এর অর্থ হবে, 'নবীদের মোহর।' কোরআন শরীফের নির্ভরযোগ্য প্রামাণিক অভিধান 'মুকরাদাতে রাগেব' এ আছে, "খতম ও তাবয়া দুটি পৃথক বিষয়। প্রথম শব্দটি মূল ও ধাতুগত ভাবে মোহরের ছাপের ন্যায় কোন বস্তুর ক্রিয়া সম্পাদন করাকে বুঝায়। ইহাই 'খতম' শব্দের ধাতুগত মৌলিক অর্থ। এবং তাবয়া শব্দের অর্থ মোহর ছাপের প্রাপ্ত-ফল, এবং এই অর্থ খতমের' মৌলিক অর্থের ক্রিয়া।"

আরবী সাহিত্যে খাতাম শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠও হয়। যেমন, খাতামুশ শোয়ারা', খাতামুল ফুকাহা, খাতা-

মুল মোহাদ্দেসীন বলতে যথাক্রমে শ্রেষ্ঠ কবি, শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ এবং শ্রেষ্ঠ মোহাদ্দেসকে বুঝায়। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বাক্যেও অনুরূপ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন তিনি এক স্থানে হযরত আব্বাস (রাঃ) সম্বন্ধে বলেন, 'নবুওতে আমি যেমন খাতামান নবীঈন, হিজরতে আপনি তদ্রূপ খাতামুল মোহাজেরীন।. (কনজুল ওম্মাল)। অন্যত্র বলেছেন, 'আনা খাতামুল আম্বিয়ায়ে ওয়া আনতা ইয়া আলী খাতামুল আওলীয়া।' (তফসীরে সাফী)। অর্থাৎ আমি খাতামুল আম্বিয়া এবং হে আলী, তুমি খাতামুল আওলীয়া। এখানে আঁ-হযরত (সাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে খাতামুল মোহাজেরীন এবং হযরত আলীকে (রাঃ) খাতামুল আওলীয়া বলতে নিশ্চয়ই শেষ মোহাজের এবং শেষ ওলী বুঝান নাই। কেননা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর পর আরও লক্ষ লক্ষ মোহাজের মোসলমানদের মধ্যে হয়েছেন এবং এখনও হচ্ছেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর পরও অসংখ্য ওলী-আল্লা এই উম্মতে জন্ম নিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও যে নিবেন তা'অস্বীকার করবার উপায় নাই। অতএব বুঝা গেল যে, আঁ-হযরত (সাঃ) এখানে শেষ অর্থে 'খাতাম' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। যে অর্থে তিনি হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে খাতামুল মোহাজেরীন এবং হযরত আলী (রাঃ)-কে খাতামুল আওলীয়া বলেছেন, সেই অর্থে তিনি নিজেকেও খাতামুল আম্বিয়া বলেছেন।

এখানে আর একটা বিষয় উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, খাতামান নবীঈন আয়াত নাজেল হওয়ার পাঁচ বৎসর পর সাহেবজাদা ইব্রাহিম যখন মারা গেলেন তখন আঁ-হযরত (সাঃ) তাঁর জানাজা পড়ে বললেন, 'লাও আশা লাকানা সিদ্দিকান নবীয়া' অর্থাৎ সে জীবিত থাকলে অবশ্যই সিদ্দিক নবী হত। (ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েজ)। এই হাদিস যে সহী তাতে কোন সংশয় নেই। (দেখুন, শেহাব আলাল বায়জবী, জেলদ ৭, পৃঃ ১৭৫)।

এই হাদিসের ব্যাখ্যায় হানাফী ফিরকার প্রসিদ্ধ ইমাম হযরত আলী আল কারী (রহঃ) লিখেছেন, 'তাঁর (ইব্রাহিমের) নবী হওয়া খোদার বাক্য খাতামান নবীঈনের বিরোধী নয়। কেননা খাতামান নবীঈন অর্থ আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর এমন কোন নবী আসবেন না যিনি তাঁর শরীয়তকে মনসুখ করবেন এবং তাঁর উম্মত হতে হবেন না।' (মওজুয়াতে কবীর)।

উপরের উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আঁ-হযরত (সাঃ) স্বয়ং 'খাতামান নবীঈন' আয়াতের অর্থ শেষ নবী মনে করতেন না। কেন না তিনি নিজেকে শেষ নবী মনে করলে 'খাতামান নবীঈন' আয়াত নাজেল হওয়ার দীর্ঘ পাঁচ বৎসর পর তাঁর পুত্র ইব্রাহিম (রাঃ) সম্বন্ধে একথা বলতেন না যে, 'সে জীবিত থাকলে অবশ্যই সত্য নবী হত।' ইমাম মোল্লা আলী কারী (রহঃ)-ও খাতামান নবীঈন বলতে যে শেষ নবী বুঝেন নাই তার প্রমাণও আমরা উপরে পেয়েছি। বরং ইমাম সাহেবের মতে হযরত ইব্রাহিম (রাঃ) জীবিত থাকলে এবং নবী হলে, অনুরূপ হযরত ওমর (রাঃ)-ও যদি নবী হতেন তাহলে তাঁরা উভয়ই উম্মতি নবী হতেন। (দেখুন, মওজুয়াতে কবীর, ৫৮ পৃঃ)। অন্য এক হাদিসে আঁ-হযরত (সাঃ) বলেছেন, 'আনা ইন্দাল্লাহি খাতামান নবীঈনা ওয়া ইন্না আদামা লামুনজাদেলুন ফি তিনিহী।' অর্থাৎ— 'আমি তখনও খাতামান নবীঈন ছিলাম যখন আদম (আঃ) কাদার মধ্যে ছিলেন।' (আহ্‌মদ)।

সর্বপ্রথম নবীর জন্মের পূর্বে খাতামান নবীঈন থাকার অর্থ শেষ নবী কিনা তা পাঠক স্থির ভাবে চিন্তা করে দেখবেন। নিশ্চয় তিনি এখানেও খাতাম ন নবীঈন বলতে শেষ নবী বুঝান নাই। কেননা এই হাদিস অনুযায়ী এক লক্ষ বা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার নবীই খাতামান নবীঈনের পরে আগমন করেছেন। খাতামান নবীঈন অর্থ শেষ নবী হলে এই লক্ষ লক্ষ নবীর আবির্ভাব কিরূপে সম্ভব হল?

অতএব এখানেও খাতামান নবীঈন অর্থ নবীদের মোহর। আঁ-হযরত (সাঃ)-কে 'নবীদের মোহর' এজন্যই বলা হয়েছে যে, তাঁর নবুওতের মোহরের তসদিক না থাকলে কাহারও পক্ষে নবী হওয়া সম্ভবপর নহে। হাদিস পাঠে জানা যায় যে, সাহাবীদের অনেকেই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে এই নবুওতের মোহরের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর দেহে মোহরের ছাপ দেখার আসল তাৎপর্য্য এই। হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে যুগে যুগে আগত সকল নবীই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর উপর ইমান এনে মোহাম্মদী নবুওতের মোহর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুলাল্লাহ'-এর ছাপ প্রাপ্ত হয়ে নবুওত লাভ করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে খাতামান নবীঈনের বদৌলতেই লক্ষ লক্ষ নবীর আগমন সম্ভব হয়েছে। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা মোহাম্মাদ কাসেম ননতুবী সাহেব লিখেছেন, "আঁ-হযরত (সাঃ) নবুওতের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন এবং তিনি ভিন্ন অন্যান্য নবীগণ নবুওতের মৌলিক গুণে গুণান্বিত ছিলেন না। অন্য নবীদের নবুওত আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কল্যাণ প্রসূত, কিন্তু তাঁর নিজের নবুওত অন্যের কল্যাণে নয়। এই ভাবে তার উপর নবুওত মোহরবদ্ধ হয়ে যায়। বস্তুতঃ তিনি যেরূপ আল্লার নবী, তদ্রূপ নবীগণেরও নবী।' (তাহাজিরুন নাস)। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর 'বিশ্ব নবী' পুস্তকে এই কথাটিকেই একটু অন্যভাবে প্রকাশ করেছেন। কলেমার ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি লিখেছেন, "আল্লা তাই বাধ্য হইয়াই নিজের অকৃত্রিমতা রক্ষা করিবার জন্য আপন নামের শেষে একটি সিলমোহর মারিয়া দিয়াছেন। ঠিক যেন একটি ট্রেড মার্ক। সেই সিলমোহরটি কী? সেটি হইতেছে মোহাম্মদের নাম, সেটি হইতেছে 'মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।' আল্লা তাই ব্যবসায়ের ভঙ্গিতেই মোহাম্মাদ সম্বন্ধে বলিয়াছেন: মোহাম্মাদ হইতেছেন খাতামান নবীঈন অর্থাৎ নবীদের মধ্যে তিনি (আমার) সিলমোহর বা ট্রেড মার্ক। তিনি তাই সমগ্র জগতে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন: সত্য বা খাঁটি আল্লাকে যদি চাও, তবে মোহাম্মদের সিল দেওয়া আল্লাকে কিনিও, নতুবা ঠকিবে। এই জন্যই আমাদের মূল কলেমা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, মোহাম্মাদ মার্কা আল্লা ছাড়া আর কেউ উপাস্য নাই।" (২২০ পৃঃ অষ্টম সংস্করণ)। ঠিক এই কথাটিই নবীদের বেলায়ও প্রযোজ্য। নবীদের সম্বন্ধে কবি সাহেবের ন্যায় বলতে গেলে বলতে হয়, "হে জগৎবাসী! যখনই কোন ব্যক্তিকে নবুওতের দাবী করতে দেখবে তখনই সতর্কতার সঙ্গে দেখে নেবে তাঁর নবুওতে মোহাম্মদী মোহরের ছাপ আছে কিনা, যদি মোহরের ছাপ থাকে তাহলে ঐ নবীর প্রতি ইমান আনবে, আর যদি মোহাম্মাদী নবুওতের সিল না থাকে তাহলে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। কেননা মোহাম্মাদ মার্কা নবী ছাড়া আর কোন নবী নাই।"

॥ বিশ্ব ধর্ম ও বিশ্ব শান্তি ॥

খোন্দকার আজমল হক

পৃথিবীর সৃষ্টি হ'তে এ পর্যন্ত জগতে যুগে যুগে বহু নবী বা অবতার এসেছেন। কেহ নুতন শরীয়ত বা বিধান নিয়ে; কেহবা পূর্ব্ববর্ত্তী নবীর শরীয়তকে মানুষের ভিতর প্রচার করার জন্য। যাঁরা শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তাঁদেরকে বলা হয় তশরীরী বা শরীয়তধারী নবী আর যাঁরা পূর্ববর্ত্তী শরীয়ত অনুসারী হ'য়ে এসেছেন তাঁদের বলা হয় গায়ের তশরীরী বা শরীরতবিহীন নবী। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্ব্বের নবীগণ যে সকল স্বর্গীয় বিধান নিয়ে এই দুনিয়ায় আসেন তাহা তৎকালীন মানুষের আত্মিক ও সামাজিক ক্রম বিকাশানুযায়ী ছিল। মানবজাতির আয়ুবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মিক ও এবং সামাজিক জীবনেরও বিকাশ লাভ হ'তে থাকে। এর ফলে তার শিক্ষার প্রসারতারও প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে।

মানব জাতিকে একটি মানব শিশুর সহিত তুলনা করা যেতে পারে। মাতৃ জঠর হ'তে পড়ার পর মানব শিশুর উপর কোন আইন বা বিধান প্রয়োগ করা হয় না। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তার উপর বিভিন্ন প্রকার বিধি ও নিষেধ আরোপিত হ'তে থাকে। একটি পূর্ণ বয়স্ক মানুষের জন্য যে আইন প্রযোয্য, একই দোষে দোষী কোন বালক বা কিশোরের প্রতি সে আইন প্রয়োগ করা হয় না। মানুষ যখন বয়সের পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, আইনের বিধি-নিষেধও তখনই তার উপর পূর্ণরূপে প্রয়োগ করা হয়।

মানব জাতির ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায় প্রাথমিক যুগে মানবজাতি একটি মানব শিশুর ন্যায়ই অজ্ঞ ছিল। যেমন প্রাথমিক যুগে মানুষ উলঙ্গ থাকত, ঘরবাড়ী তৈয়ার করতে জানত না, পোষাক পরতে জানত না; আগুনের ব্যবহার জানত না- যার ফলে তা'রা কাঁচা মাংস খেয়ে জীবন ধারণ করত। তখন তাদের প্রাথমিক শিক্ষার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই, তৎকালিন মানুষের আত্মিক বিকাশানুযায়ী শরীয়তের কয়েকটি ধারা দিয়ে আল্লাহ্তায়ালা তাঁর প্রথম খলিফা বা নবীরূপে হযরত আদম (আঃ)-কে এই জগতে পাঠান। তিনি এবং তাঁর পরবর্ত্তী কয়েক জন নবী কিছুকাল ঐ বিধান সমূহ দ্বারা মানুষদের শিক্ষা দেন। পরবর্ত্তীকালে মানব জীবনের বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে নুতন শিক্ষারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেজন্য দেখা যায় হযরত আদম (আঃ)-এর পরবর্ত্তী নবী হযরত নূহ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ্তায়ালা আরও নূতন বিধান বা শিক্ষা পাঠান। এই কারণেই হযরত ইব্রাহিম ও মুসা (আঃ)-এর নিকট প্রেরীত বিধান সমূহে শরীয়তের আরও কিছু ধারা সংযোযিত হয়। এইরূপ মানবজাতি হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমনের সময় তার বয়সের পূর্ণতালাভ করে। তখন দুনিয়ার সকলের জন্য এক শরিয়তেরও প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। আল্লাহ্-তায়ালা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নিকট তাই পূর্ণ শরীয়ত কোরআন নাজেল করে তা'তে ঘোষণা করেন,

"আল ইয়াওমা আকমালতো লাকোম দিনাকোম ওয়া আৎমামত আলায়কোম নিমাতি ওয়া রাজিইতো লাকোম ইসলামা দ্বীনা।'—(সুরা মায়দা)।

অর্থ ঃ—আজি হ'তে তোমাদের ধর্মকে পূর্ণতা দান করিলাম এবং আমার নিয়ামত সমূহও পূর্ণরূপে দিলাম এবং তোমাদের জন্য "ইসলাম'কে ধর্ম হিসাবে মনোনীত করিলাম।

উপরিউক্ত আয়াত নাজেল করে আল্লাহ্তায়ালা দুনিয়ার সকল মানুষকে জানিয়ে দিলেন যে, হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে যে শরীয়ত যে শিক্ষা দিয়ে জগতে পাঠান হ'ল তারপর আর কোন শরীয়ত বা শিক্ষা আল্লার তরফ হ'তে এ দুনিয়ায় আসবে না। মানুষের হেদায়েত বা শিক্ষার জন্য যতপ্রকার বিধানের প্রয়োজন সবই কোরআনে নিহিত আছে।

অনুসরণ করলে আল্লার নিয়ামত সমূহও মানুষ পূর্ণরূপে লাভ করতে পারে, এবং এই কোরআনের অনুসরণকারী-গণই একমাত্র আল্লার নৈকট্যলাভে সমর্থ হ'তে পারে। তিনি আরও জানিয়ে দিলেন যে, জগতের জন্য এখন হ'তে একমাত্র ধর্মই হবে ইসলাম'। যেহেতু পূর্বের অপূর্ণ শরীয়ত সমূহ বর্তমান মানুষের প্রয়োজন মিটাতে সক্ষম নয় সেহেতু উহা বাতিল করা গেল।

আজ সমগ্র জগৎ একই যোগসূত্রে আবদ্ধ হ'তে চলেছে ; সুতরাং সমগ্র বিশ্বের জন্য একজাতি এক ধর্মের প্রয়োজন অন্যথায় অশান্তির আগুন সারা বিশ্বে দাবানলের ন্যায় জ্বলতে থাকবে। পূর্বে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে নবী পাঠান হ'ত, এখন যেহেতু সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা—সমগ্র মানব জাতিকে এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন, সেহেতু হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য হেদায়েতকারী রসুল হিসাবে পাঠান হল। আল্লাহ্‌তায়ালাও কোরআন পাকে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন ঃ—

কোল ইয়া আইয়োহান নাস, ইন্নিরাসুলুল্লাহে এলায় কোম জামিয়া।" (সুরা আরাফ)।

"(হে মোহাম্মাদ) বল হে জগতের মানুষ সকল, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য রসুল হিসাবে প্রেরীত হইয়াছি।" তাই হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) বিশ্ব নবী এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম বিশ্ব ধর্ম। বিশ্বে ক্রম বর্দ্ধমান উন্নতির ভিতর দিয়ে সৃষ্টিকর্তা ইহাই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, সমগ্র বিশ্ব একদিন এক পরিবারের ন্যায় গন্য হ'বে এবং এমন একদিন আসবে যখন সমগ্র মানব এক জাতিতে পরিণত হবে। ইহাই সৃষ্টি কর্তার অভিপ্রায়।

ইতিপূর্বে যে সমস্ত নবী বা অবতার সৃষ্টি কর্তার বিধান নিয়ে এই দুনিয়ায় এসেছেন তাঁরাও নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থে বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন এবং নিজ নিজ অনুসারিদের তাঁকে গ্রহণ করবার জন্য নির্দ্দেশও দিয়ে গিয়েছেন। বর্তমান বিশ্বে যত ধর্ম আছে, তাদের গ্রন্থ সমূহে ইহা পরিষ্কার রূপে বর্ণনা করা আছে। কিন্তু আফসোস উহাদের জন্য, যাহারা নিজেদের ধর্ম্মিয় নির্দ্দেশকে নিজেদের অহমিকার দরুণ উপেক্ষা করছে। আজ প্রতিটি গ্রন্থধারী নিজ গ্রন্থকে পরিত্যাগ করার দরুনই তাদের সৃষ্টি কর্তার নির্দ্দেশকে অমান্য করে চলেছে। বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ হ'তে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। সৃষ্টি কর্তার উদ্দেশ্য কি ইহাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে ঃ—

১। হিন্দুদের আদিগ্রন্থ বেদ বলছে

(ক) আল্লা জ্যোষ্ঠাং শ্রেষ্ঠং পরমং
পূর্ণং ব্রহ্মন মন্নাং
আল্লার রসুল মহমদরকং বরস্য
আল্লা অল্লাম অদল্ল বুক মেফফম
আল্লা বুক লিখদ কম।"

"আল্লাই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তিনি সর্ব্ব দিক দিয়া অদ্বীতিয়। পরম পবিত্র ও নির্ম্মল। মোহাম্মাদ (সাঃ) আল্লার প্রেরীত রসুল। সকলের বরন্য তিনি সকল অবতারের শ্রেষ্ট এবং খাঁটি ধর্ম প্রচারক। (অথর্ববেদ আল্লাপনিষদ।)

(খ) "আল্লার রসুল মহমদরকং বরস্য
আল্লা আল্লম ইল্লাল্লাহ ইল্লাল্লাহ।"

"আল্লার রসুল মোহাম্মাদ (সাঃ) সকলেরই বরনীয় বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"—(সামবেদ)।

২। খৃষ্টান ধর্ম গ্রন্থ বাইবেলে পাওয়া যায়।

(ক) তথাপি আমি সত্য বলিতেছি আমার যাওয়া তোমাদের জন্য মঙ্গল কেননা আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকট আসিবেন না। কিন্তু আমি যদি যাই তবে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব, (যোহন—১৬।৭)।

(খ) তোমাদিগকে বলবার আমার আরও অনেক কথা আছে ; কিন্তু তোমরা এখন তাহা সহ্য করিতে পার না। পরন্তু তিনি সত্যের আত্মা যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিমকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন ; কারণ তিনি অজানা হইতে কিছু বলিবেন না কিন্তু যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। (যোহন—১৬।১২-১৪)।

৩। ইহুদী ধর্ম্মগ্রন্থ তৌরাত বলছে ঃ

মহাপ্রভু হযরত মুসা আঃ)-কে বলিলেন "বণি ইস্রাইলদের ভ্রাতৃ সম্পর্কের বণি-ইসমাইলদের ভিতর আমি তোমারই মত একজন ভাববাদী পাঠাইয়া দিব। (দ্বীতিয় বিবরণ ১৮।১৮)।

৪। পারশীকদের ধর্ম্ম গ্রন্থ জেন্দাবস্তা বলছে ঃ

"পরম দয়ালু তিনি সেই জাতির রাজ্য স্থাপয়িতা হইবেন, তাঁহার নাম হইবে মোহাম্মাদ, দয়ার প্রতি মূর্ত্তি তিনি পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য প্রেরীত হইবেন। (জেন্দাবস্তা—২৪)

পাঠক, দেখতে পেলেন পূর্ববর্তী অবতায় বা ভাববাদীগণ সকল ধর্মের সমন্বয় সাধনকারী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর আগমন সম্বন্ধে কত পরিস্কারভাবে ভবিষ্যৎবাণী করে গিয়েছেন।

স্রষ্টকর্তা তাঁর প্রতিজ্ঞ নুযায়ী ঠিক উপযুক্ত সময়েই বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মহামানব হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-কে দুনিয়ায় প্রেরণ করে তাঁর দ্বারা বলালেন—

"(হে মোহাম্মদ (সাঃ)) বল, হে দুনিয়ার মানব সকল, আমি তোমাদের সকলের জন্য হেদায়েতকারী রসুল হিসাবে আল্লার তরফ হইতে আসিয়াছি। আমাকে গ্রহণ করার ভিতরই তোমাদের মঙ্গল।"

হে জগৎবাসিগণ, আজ সমগ্র বিশ্বে অশান্তির আগুন যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, উহা হ'তে রক্ষা পেতে হলে বিশ্বের সকল ধর্মের সমন্বয় সাধনকারী মহাপুরুষ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ) দ্বারা প্রচারিত বিধান অনুসরণে দ্রুত এগিয়ে এস। এর ভিতরই রয়েছে বিশ্বের সর্বপ্রকার কল্যাণ। বিশ্ব ধর্মের মাধ্যমে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলার দ্বারাই বিশ্ব শান্তি সম্ভব। জগতের বর্ণ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ তখন দূর হবে যখন সমস্ত বিশ্বের মানুষ স্রষ্টিকর্তার মননিত ধর্ম "ইসলামের" সুশিতল ছায়াতলে একত্রিত হয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। স্রষ্টিকর্তা তাঁর মননিত 'ধর্মের নাম ইসলাম' অর্থাৎ "শান্তি" রেখে বিশ্ব শান্তির পথই নির্দেশ করেছেন।

যে দিন সমগ্র বিশ্বে একধর্ম, একজাতি স্রষ্টি হ'বে সেই দিনই বিশ্ব শান্তি সম্ভব হবে। আজ বিশ্বে শান্তি আনয়নের জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র প্রতিযোগিতারও বিরাম নেই। অস্ত্র প্রতি-যোগিতায় বিশ্বে ধ্বংসই সম্ভব ; বিশ্ব শান্তি নয়।

পূর্বে 'লীগ অফ নেশান" বা পরবর্তীকালে "ইউনাটেড নেশনের" মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। "লীগ অফ নেশানের' ব্যার্থতার ফলেই "ইউনাইটেড নেশনের" স্রষ্টি। কিন্তু ইহাও পৃথিবীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সক্ষম হয় নাই। জাতিতে জাতিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ (cold war) উত্তোরত্তর বেড়েই চলেছে। ভিয়েতনাম, কাশ্মীর, ফেলিস্তিন, সাইপ্রাস প্রভৃতি সমস্যা তার সামনে রয়েছে। কোনটারই সন্তোষ জনক সমাধান জাতিসংঘ আজ পর্য্যন্তও করতে পারে নাই। ইহা ব্যতিত বর্ণ বৈষম্য, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধ করার ক্ষমতা জাতিসঙ্ঘের নাই। তাই আজ জগতে অশান্তির আগুন তুষানলের ন্যায় জ্বলছে। সমস্ত বিশ্ব আজ ৩য় বিশ্ব যুদ্ধের হুমকির সম্মুখিন।

বিগত ইতিহাস এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, বিশ্ব সমস্যার সমাধান জড়বাদিতার দ্বারা সম্ভব নয়। যতদিন পর্য্যন্ত বিশ্বের মানুষ স্রষ্টিকর্ত্তার নির্দ্দেশিত

এবং বিশ্ব-শান্তির অগ্রদূত হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত জাতিসঙ্ঘ একত্রিত না হচ্ছে ততদিন অশান্তির আগুন জ্বলতেই থাকবে। জগৎকে আজ একজাতি হিসাবে এক নেতার অধীনে পরিচালিত হ'য়ে সমগ্র বিশ্বে ইসলামিক খেলাফত কায়েম করতে হবে। অন্যথায় বিশ্বের ধ্বংস অনিবার্য্য।

বিশ্বের ক্রম বর্দ্ধমান অশান্তি ও অরাজগতা দেখে বিখ্যাত ইংরাজ চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক জর্জ বার্ণার্ডশ' তাই বলেছেন, "মধ্য যুগের খ্রীষ্টান পণ্ডিতগণ অজ্ঞানতা বঃ অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে ইসলামকে জঘন্যরূপে প্রচ. করত। প্রকৃতপক্ষে তারা এমনভাবে গড়িয়া উঠিত যাহাতে মোহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁহার ধর্মকে ঘৃণা করে। তাহাদের মতে মোহাম্মাদ (সাঃ) খ্রীষ্টের শত্রু ছিলেন। আমি তাঁহার জীবনী পাঠ করিয়া দেখিয়াছি; তিনি এক আশ্চর্য্য শক্তি সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। এবং আমার বিশ্বাস তিনি খ্রীষ্টের শত্রুত' দূরের কথ তাঁহাকে মানবতার মুক্তিদাতা বলা উচিৎ। আমার দৃ. বিশ্বাস যদি এইরূপ কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান যুগে একনায়কত্ব গ্রহন করেন তাহা হইলে তিনি বর্ত্তমান সমস্যাগুলর এরূপ সমাধান করিতে সক্ষম হইবেন যে পৃথিবী এক শান্তি আনন্দে পূর্ণ হইবে"

জগৎবাসীর সামনে আজ দুটি পথই খোল আছে, হয় শান্তির ধর্ম ইসলমের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত হয়ে নিজেদের এক জাতিতে পরিণত করে জগতে আল্লার রাজ্য কায়েম করা অথবা জাতিতে জাতিতে দ্বন্দের মাধ্যমে নিজেদের ধ্বংস করা।

আজ হতে প্রায় ৮০ বৎসর পূর্ব্বে পরম দয়ালু সৃষ্টিকর্ত্তা ইসলামিক জাতিসঙ্ঘে সমগ্র বিশ্ব-বাসীকে একত্রিত করবার জন্য পুনরায় বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর উম্মত হতে একজন ত্রাণকর্ত্তাকে দাঁড় করান। বিভিন্ন ধর্মে তাঁহাকে বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেউ মসিহ, কেউ মাহদী, কেউ কল্কি বলে তাঁকে আখ্যায়িত করেছেন। আল্লাহ্‌-তায়ালার নিকট হ'তে প্রত্যাদেশ লাভ করে তিনি ঘোষণা করলেন, "পৃথিবীতে একমাত্র ইসলামই সত্য ধর্ম এবং কোরআনে বর্ণিত খোদা ছাড়া আর কোন খোদা নাই।" তিনি আরও ঘোষণা করলেন,

"সৃষ্টিকর্ত্তা চাহিতেছেন যে, ইউরোপ, আমেরিকা তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল পবিত্রচেতা ব্যক্তিগণকে একেশ্বরের দিকে আকৃষ্ট করেন এবং তাঁহার ভক্তগণকে এক ধর্মে দীক্ষিত করেন। ইহাই সৃষ্টিকর্ত্তার অভিপ্রেত।"

হে বিশ্ববাসীগণ। জ্ঞান চক্ষু, উন্মিলিত করুন, নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। যদি জগতের শান্তি চান; যদি সৃষ্টিকর্ত্তার আদেশ অমান্যের দরুন শান্তি পেতে না চান তবে বিশ্ব-শান্তির আহ্বায়ক বিশ্ব-নবী হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জাতিসঙ্ঘে একত্রিত হবার জন্য শেষ যুগের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ যে ডাক দিয়েছেন তা'তে সাড়া দিন এবং বিশ্ব-ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে জগতে স্বর্গরাজ্য কায়েম করুন।

★

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাকা মসজিদ

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে গত ২৫শে আগষ্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহ্‌মদীপাড়ায় পাকা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখা হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্‌।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত ভিত্তি স্থাপনের জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কাদিয়ানের একটি ইট দোয়া করিয়া জনাব আবুল আতা জলন্ধরী সাহেব মারফত পাঠাইয়াছিলেন।

শুক্রবার জুমার নামাযান্তে দোয়ার পর উক্ত ইট স্থাপন করেন পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব। আমীর সাহেবের সহিত জনাব ব্যারিষ্টার মুহাম্মদ শামসুর রহমান সাহেব, জনাব মুহম্মদ শহিদুর রহমান সাহেব গিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়ে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিশিষ্ট আহ্‌মদীবৃন্দও ইট স্থাপন করেন।

উক্ত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহ্‌মদী সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

আনসারউল্লার এজতেমা উপলক্ষে সদরের ৩ জন বুজুর্গের পূর্ব পাকিস্তান সফর

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জামাতে আনসারুল্লাহর এজতেমায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাবওয়া হইতে তিনজন বুজুর্গ গত ১০ই সেপ্টেম্বর ঢাকা আগমন করিয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন মোকররম কাজী নজির আহমদ লায়ালপুরী (নাজের এসলাহ্‌ ও ইরশাদ) চৌধুরী ফজল আহমদ সাহেব (নাজের দেওয়ান) এবং জনাব আল-হাজ শাবির আহমদ (ওয়াকিলুল মাল তাদরিকে জদীদ)। তাঁহারা ঢাকা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চট্টগ্রাম, সুন্দর বন, এবং আহমদনগরে আনসারুল্লার এজতেমায় অংশ গ্রহণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত বুজুর্গগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পাকিস্তান সফর কালে কুমিল্লা, ময়মনসিং, যশোহর, উথলি, চুয়াডাঙ্গা, নাটোর, দিনাজপুর, ভাতগাঁ এবং রংপুর আঞ্জুমন পরিদর্শন করিবেন। প্রাদেশিক আমীর মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব এবং প্রাদেশিক নাজেম আলা আনসারউল্লাহ্‌ জনাব শামসুর রহমান সাহেব বার-এট ল, সদরের বুজুর্গদের সহিত এই সফরে সামিল থাকিবেন।

★

খ্রীষ্টান এবং অন্যান্য জাতির নিকট ইসলাম প্রচার করিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)	লিখক—আহমদ তৌফিক চৌধুরী
২।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	" "
৩।	ওফাতে ইসা ইবনে মরিয়াম	" "
৪	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ	" "
৫।	হোশায়া	" "
৬।	ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব	" "
৭।	দাজ্জাল ও ইয়াজুজ-মাজুজ	" "
৮।	খত্‌মে নবুওত ও বুজুর্গানের অভিমত	" "
৯।	বিভিন্ন ধর্মে শেষ যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ	" "
১০।	বাইবেলের শিক্ষা বনাম খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস	" "

প্রাপ্তিস্থান

এ. টি. চৌধুরী

কাছ্‌রে ছলীব পাবলিকেশন্স

২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

উপযুক্ত ডাক টিকিট পাঠান

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1

Phone No. 83635

Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.